BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04020026

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 02 | February 2026 | e-ISSN: 2584-1890

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "পথের প্রান্তে" নাটকে সমাজ ও রাজনীতির প্রভাব: সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

Debashruti Samanta

Assistant professor in Bengali method of Indira Gandhi Memorial B.Ed College & M.A in Bengali,B.ed, M.ed.UGC Net, wbset, SLET (n.e region) Qualified. Email: debashrutisamanta@gmail.com

সারসংক্ষেপ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত পথের প্রান্তে নাটকটি স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি সমাজের এক গভীর সংকটময় পর্বের শিল্পিত দলিল। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে নাটকটিতে সমাজ ও রাজনীতির প্রভাবকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক আদর্শভঙ্গের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন নাটকের মূল উপজীব্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, আদর্শ ও বাস্তবতার সংঘাত, এবং প্রজন্মগত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নাট্যকার সময়ের মানসিক অস্থিরতাকে উন্মোচিত করেছেন।

নাটকের প্রতীকধর্মী নাম—'পথ' ও 'প্রান্ত'—ইতিহাসের গতি ও এক যুগসন্ধিক্ষণের সীমারেখাকে নির্দেশ করে। সংলাপনির্ভর নাট্যরীতি, সংযত ভাষাশৈলী এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সংকটকে বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর হতাশা, নৈতিক অবক্ষয় এবং পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ চরিত্রগুলির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ফলে নাটকটি কেবল একটি পারিবারিক কাহিনি নয়; বরং এটি সমাজ-রাজনীতির গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের নন্দনরূপ। সামগ্রিকভাবে, "পথের প্রান্তে" একটি যুগান্তরের মানসিক ও সামাজিক রূপান্তরের শিল্পিত দলিল হিসেবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

মূল শব্দ: *মধ্যবিত্ত সংকট; স্বাধীনতা-উত্তর হতাশা; সমাজ-রাজনীতি; প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব; প্রতীকধর্মিতা।*

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সৃজনশীল রচনায় সমকালীন সমাজজীবনের টানাপোড়েন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংকটকে গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে জনপ্রিয় হলেও তাঁর নাট্যরচনায় সময়সচেতনতা, সমাজমনস্তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। তাঁর রচিত *পথের প্রান্তে* বাংলা নাট্যধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, যেখানে ব্যক্তিগত জীবনের সংকট বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে।

এই নাটক কেবল একটি পারিবারিক বা ব্যক্তিনির্ভর কাহিনি নয়; বরং এটি এক যুগসন্ধিক্ষণের দলিল। এখানে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, আদর্শ ও বাস্তবতার সংঘাত, স্বপ্ন ও হতাশার দ্বৈততা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় নাট্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের চরিত্ররা যেন সময়ের প্রতিনিধি—তাদের চিন্তা, দুঃখ, প্রতিবাদ ও আত্মসমর্পণ সমকালীন বাঙালি সমাজের মানসিক প্রতিচ্ছবি।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে "পথের প্রান্তে" নাটকে সমাজ ও রাজনীতির প্রভাবকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হবে। বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসন-উত্তর সময়ের পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামো, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আদর্শগত দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক হতাশা, নৈতিক অবক্ষয় এবং মানবিক মূল্যবোধের অবনমন—এসব বিষয় নাটকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশদভাবে আলোচিত হবে। পাশাপাশি নাটকের প্রতীক, সংলাপ, চরিত্র নির্মাণ এবং নাট্যরীতির মধ্য দিয়ে লেখক কীভাবে সময়ের অন্তর্নিহিত সংকটকে শিল্পরূপ দিয়েছেন, তারও বিশ্লেষণ করা হবে।

নাটকের নাম "পথের প্রান্তে" নিজেই তাৎপর্যপূর্ণ। 'পথ' এখানে জীবনের যাত্রামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসের অগ্রগতি ও সা , যেখানে পুরোনো মূল্যবোধের অবসান ঘটছে এবং নতুন পথের সূচনা অনিশ্চিত। এই —মানে এক সীমান্তরেখা 'প্রান্ত' আর ;প্রতীক দ্বন্দ্ব ও সন্ধিক্ষণের শিল্পিত র ,নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে নাটকটি মূলত পরিবর্তনূপায়ণ।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট:

নাটকটি রচনার সময়কাল ছিল এক অস্থির যুগ। ব্রিটিশ শাসনের অবসান, স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস, দেশভাগের ট্র্যাজেডি, শরণার্থী সমস্যার বিস্তার এবং রাজনৈতিক আদর্শের বিভাজন—এসবই বাঙালি সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ছিল এক ঐতিহাসিক অর্জন, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত দেশভাগের বেদনা সমাজকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। এই শরণার্থীদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সংহতি ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। শহর কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠে বস্তি, কলোনি ও অস্থায়ী আবাসনের বিস্তার ঘটে। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়।

এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে এক নতুন শ্রেণিসংকট দেখা দেয়। শিক্ষিত বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থানের অভাব তরুণ প্রজন্মকে হতাশ ও সংশয়ী করে তোলে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, অন্যদিকে পুঁজিবাদী বাস্তবতা—এই দ্বৈততার মধ্যে সাধারণ মানুষ পথ খুঁজে পায় না।

"পথের প্রান্তে" নাটকে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার ছায়া সুস্পষ্ট। চরিত্রদের জীবনে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও নৈতিক সংকট দেশভাগ-উত্তর সমাজের প্রতিফলন। তাদের সংলাপে স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ফারাক ধরা পড়ে। স্বাধীনতা যে কেবল রাজনৈতিক মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার প্রশ্নও—এই উপলব্ধি নাটকের অন্তঃসলিল স্রোত হিসেবে কাজ করে। নাটকে পারিবারিক ভাঙন ও প্রজন্মগত দ্বন্দ্বও এই সামাজিক পরিবর্তনের ফল। প্রবীণ প্রজন্ম যারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল, তারা আদর্শবাদী; কিন্তু তরুণ প্রজন্ম বাস্তবতার কঠোর মুখোমুখি হয়ে সংশয়ী ও বিদ্রোহী। এই প্রজন্মসংঘাত মূলত সমাজের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের প্রতীক।

অতএব, ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা ছাড়া "পথের প্রান্তে" নাটকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এটি এমন এক সময়ের শিল্পরূপ, যখন সমাজ এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—পেছনে অতীতের আদর্শ, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এই দ্বিধাবিভক্ত অবস্থাই নাটকের মূল সুরকে গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে।

নাটকের কাহিনি ও মূল সুর:

পথের প্রান্তে নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকটময় জীবন, যা কেবল একটি পারিবারিক দ্বন্দ্বের কাহিনি নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের শিল্পরূপ। পরিবারটির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, প্রজন্মগত মতবিরোধ এবং আদর্শগত বিভ্রান্তি একত্রে এমন এক বাস্তবতা নির্মাণ করে, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের সীমারেখা প্রায় বিলীন হয়ে যায়।

নাটকের কাহিনিতে আমরা দেখি—পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা অতীতের আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, নৈতিকতা ও সততার আদর্শে জীবন গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা তাদের সেই স্বপ্নকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। অন্যদিকে তরুণ প্রজন্ম বাস্তববাদী, কখনো সংশয়ী, কখনো বিদ্রোহী। তারা সমাজের ভাঙন, বেকারত্ব, রাজনৈতিক দ্বিচারিতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রত্যক্ষ করে হতাশ। এই প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব নাটকের কাহিনিকে গতিশীল করে তোলে। পরিবারের

সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতার দিকে অগ্রসর হয়। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা পারিবারিক ঐক্যকে দুর্বল করে। কর্মসংস্থানের অভাব, সামাজিক মর্যাদাহানির ভয় এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তি চরিত্রদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ফলে তাদের কথোপকথনে তিক্ততা, হতাশা এবং আত্মসমালোচনার সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটকে প্রত্যেক চরিত্র যেন একটি বিশেষ সামাজিক মানসিকতার প্রতিনিধি। কেউ আদর্শবাদী, কেউ আপসহীন, কেউ আবার বাস্তবতার চাপে নতিস্বীকারকারী। এই বহুমাত্রিক চরিত্র নির্মাণ নাটককে কেবল কাহিনিনির্ভর রাখে না; বরং তা মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র তৈরি করে। ব্যক্তিগত সংকট এখানে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার প্রতিফলন। নাটকের নাম "পথের প্রান্তে" নিজেই গভীর প্রতীকধর্মী। 'পথ' এখানে জীবনযাত্রা, ইতিহাসের গতি এবং সামাজিক বিবর্তনের প্রতীক। 'প্রান্ত' নির্দেশ করে এক সীমারেখা—যেখানে পুরোনো আদর্শের সমাপ্তি ঘটছে, অথচ নতুন পথের দিশা এখনো অনির্দিষ্ট। এই নামকরণ নাটকের মূল সুরকে ধারণ করে: মানুষ যেন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, পেছনে অতীতের স্মৃতি ও আদর্শ, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

এই প্রতীকী অর্থ নাটকের ঘটনাপ্রবাহেও প্রতিফলিত। চরিত্ররা কোনো চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছাতে পারে না; বরং তারা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই অসম্পূর্ণতা ও অনিশ্চয়তাই নাটকের বাস্তবধর্মিতা। কারণ স্বাধীনতা-উত্তর সমাজও ছিল এমনই—উত্তেজনা ও আশার পাশাপাশি গভীর সংশয় ও হতাশায় পূর্ণ। মূল সুরের দিক থেকে নাটকটি এক দ্বন্দ্বের কাহিনি—আদর্শ বনাম বাস্তবতা, স্বপ্ন বনাম হতাশা, ঐক্য বনাম বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই নাট্যকার মানবিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত রাখেন। চরিত্ররা যতই সংকটে পড়ুক, তাদের অন্তর্লোকে একটি প্রশ্ন জাগ্রত থাকে—নতুন পথ কি সম্ভব? এই প্রশ্নই নাটকের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং তার সামাজিক তাৎপর্যকে গভীর করে তোলে।

সমাজচেতনার প্রতিফলন:

পথের প্রান্তে নাটকে সমাজচেতনার যে বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে, তা কেবল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং চরিত্রদের মানসিক দ্বন্দ্ব, সংলাপ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নৈতিক সংশয়ের ভেতর দিয়ে তা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ এখানে কেবল পটভূমি নয়—এটি নাটকের একটি সক্রিয় চরিত্রের মতো, যা প্রত্যেক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

মধ্যবিত্ত সংকট: নাটকের প্রধান শক্তি হলো মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব চিত্রণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণি সাধারণত আদর্শবাদ, আত্মসম্মানবোধ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে সংবেদনশীল। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক বাস্তবতায় অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এই শ্রেণিকে গভীর সংকটে ফেলে। নাটকের চরিত্ররা এই সংকটের জীবন্ত প্রতিরূপ। তারা শিক্ষিত, স্বপ্নদ্রষ্টা, কিন্তু বাস্তবতার কঠোর আঘাতে বারবার হতাশ। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। একদিকে আদর্শ রক্ষা করার তাগিদ, অন্যদিকে সংসারের চাহিদা পূরণের বাধ্যবাধকতা—এই দ্বন্দ্ব চরিত্রদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। কখনো তারা আপস করতে বাধ্য হয়, কখনো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই আপস ও প্রতিবাদের টানাপোড়েনই মধ্যবিত্ত জীবনের চিরন্তন সংকটকে প্রকাশ করে। নাট্যকার সূক্ষ্ম সংলাপ ও পরিস্থিতির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে মধ্যবিত্ত মানুষের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হলো—স্বপ্ন ও বাস্তবতার ব্যবধান। এখানে মধ্যবিত্ত সংকট কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি নৈতিক ও মানসিকও। সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে চরিত্ররা কখনো নিজেদের সত্য অনুভূতিকে দমন করে। ফলে তাদের অন্তর্জীবনে সৃষ্টি হয় এক গভীর নিঃসঙ্গতা, যা সমাজের বৃহত্তর বিচ্ছিন্নতার প্রতীক।

পারিবারিক মূল্যবোধের পরিবর্তন: সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক মূল্যবোধেও আমূল পরিবর্তন আসে। একসময় যে পরিবার ছিল ঐক্য, আস্থা ও পারস্পরিক নির্ভরতার কেন্দ্র, তা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতার দিকে এগোয়। নাটকে এই পরিবর্তন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রবীণ প্রজন্ম আদর্শবাদী—তারা সততা, ত্যাগ ও নৈতিকতার উপর বিশ্বাসী। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ অতীতের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে তরুণ প্রজন্ম বাস্তববাদী, কখনো সংশয়ী, কখনো বিদ্রোহী। তারা প্রশ্ন তোলে—কেবল আদর্শ দিয়ে কি জীবন চলে?

এই দ্বন্দ্ব কেবল ব্যক্তিগত মতপার্থক্য নয়; এটি সমাজের পরিবর্তনশীল মানসিকতার প্রতীক। স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ, রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সামাজিক অবক্ষয় তরুণ প্রজন্মকে হতাশ ও প্রতিবাদী করে তোলে। ফলে পরিবারে এক ধরনের মানসিক দূরত্ব

সৃষ্টি হয়। পারিবারিক সম্পর্কের এই টানাপোড়েন সমাজের বৃহত্তর ভাঙনের প্রতিফলন। পরিবার যেন রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ—যেখানে মূল্যবোধের পরিবর্তন ও আদর্শের সংকট স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

নারীচরিত্রের অবস্থান: নাটকে নারীচরিত্র কেবল গৃহবন্দি বা নিষ্ক্রিয় নয়; তারা সমাজচেতনার সক্রিয় অংশ। তাদের দুঃখ, প্রতিবাদ, সহিষ্ণুতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ সমাজের লিঙ্গ-অসমতার প্রশ্ন তোলে। নারীচরিত্ররা সংসারের ভার বহন করে, কিন্তু তাদের মতামত প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। এই অবহেলা কেবল পারিবারিক নয়; এটি সামাজিক কাঠামোর ফল। নাট্যকার দেখিয়েছেন যে সমাজের পরিবর্তন নারীদের জীবনেও প্রভাব ফেলে। তারা কেবল সহনশীল নয়, প্রয়োজনে প্রতিবাদীও। নারীর আত্মপরিচয় সন্ধান এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা প্রশ্ন তোলে—তাদের অস্তিত্ব কি কেবল সংসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ? এই প্রশ্ন সামাজিক পরিবর্তনের সূচক হিসেবে কাজ করে। নারীর আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সমাজের নতুন দিশার ইঙ্গিত দেয়। নাটকে নারীচরিত্রের উপস্থিতি তাই কেবল পারিবারিক আবেগের বাহক নয়; তারা সামাজিক রূপান্তরের প্রতীক। তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা উভয়ই প্রতিফলিত হয়।

রাজনৈতিক প্রভাবের বিশ্লেষণ:

পথের প্রান্তে নাটকে রাজনৈতিক প্রভাব কোনো সরাসরি দলীয় প্রচার বা মতাদর্শের ভাষ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা চরিত্রদের মানসিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক অবস্থান ও পারিবারিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতা, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, আদর্শের অবক্ষয় এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রসার নাটকের অন্তঃসলিলা স্রোত হিসেবে কাজ করে। নাট্যকার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ ও প্রতীকী পরিস্থিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর হতাশা: স্বাধীনতা ছিল এক মহৎ স্বপ্ন—ন্যায়, সমতা ও মানবিক মর্যাদার প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ তা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেনি। প্রশাসনিক দুর্বলতা, দলীয় কোন্দল, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সাধারণ মানুষের মনে গভীর হতাশা সৃষ্টি করে। নাটকের চরিত্ররা এই হতাশার প্রতিনিধিত্ব করে। তারা স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেই আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পায় না। ফলে তাদের মনে জন্ম নেয় সংশয় ও বেদনা। এই হতাশা কেবল রাজনৈতিক নয়; তা ব্যক্তিগত জীবনেও ছায়া ফেলে। সংসারের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক মর্যাদাহানি এবং কর্মসংস্থানের সংকট রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা দেয়। নাটকে এই হতাশা প্রকাশ পায় সংলাপের অন্তর্নিহিত তিক্ততায়। চরিত্ররা প্রশ্ন তোলে—স্বাধীনতা কি কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন? সাধারণ মানুষের জীবনে কি সত্যিই কোনো মৌলিক পরিবর্তন এসেছে? এই প্রশ্নগুলো নাটককে একটি গভীর রাজনৈতিক মাত্রা প্রদান করে।

আদর্শ বনাম বাস্তবতা: রাজনৈতিক আদর্শ ও বাস্তব জীবনের ব্যবধান নাটকের অন্যতম প্রধান সুর। স্বাধীনতার পূর্বে যে আদর্শবাদী চেতনা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, স্বাধীনতার পরে তা ক্রমে ম্লান হয়ে যায়। আদর্শবাদী চরিত্ররা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অসহায় বোধ করে। নাট্যকার দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক আদর্শ কেবল বক্তৃতা বা প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা মানুষের জীবনে কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে না। বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান না হলে আদর্শের মূল্য কমে যায়। এই দ্বন্দ্ব চরিত্রদের মানসিক ভাঙনের কারণ হয়। তারা একদিকে নৈতিকতা ও সততার মূল্যবোধে বিশ্বাসী, অন্যদিকে বাস্তবতার চাপে আপস করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের অন্তর্জীবনে জন্ম নেয় দ্বৈততা। এই দ্বৈততাই নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যকে গভীর করে তোলে। নাট্যকার কোনো সরাসরি রাজনৈতিক ভাষ্য দেননি; বরং চরিত্রদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত ভাঙন ও দুর্বলতাকে প্রকাশ করেছেন। আদর্শ ও বাস্তবতার সংঘাত এখানে এক সামাজিক ট্র্যাজেডির রূপ ধারণ করেছে।

নৈতিক অবক্ষয়: ক্ষমতা ও স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম দেয়। যখন ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায় এবং জনকল্যাণ গৌণ হয়ে যায়, তখন সামাজিক মূল্যবোধ ক্ষীণ হয়। নাটকে এই অবক্ষয় সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।চরিত্রদের মধ্যে দেখা যায় স্বার্থরক্ষা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আপসের প্রবণতা। কেউ কেউ নৈতিকতার প্রশ্নে দৃঢ় থাকলেও অধিকাংশই পরিস্থিতির চাপে নতিস্বীকার করে। এই আপসের মানসিকতা সমাজের বৃহত্তর অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি। নাট্যকার দেখিয়েছেন, নৈতিক অবক্ষয় কেবল রাজনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা পরিবার ও ব্যক্তিজীবনেও প্রবেশ করে। ফলে

সম্পর্কের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট দেখা দেয়। এই সংকট সমাজের ভাঙনের ইঙ্গিত বহন করে। ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ, প্রতীকী পরিস্থিতি এবং চরিত্রদের মানসিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নাট্যকার রাজনৈতিক স্বার্থপরতার সমালোচনা করেছেন। তিনি সরাসরি নিন্দা না করে বাস্তব পরিস্থিতির চিত্র অঙ্কন করেছেন, যা পাঠক বা দর্শককে নিজস্ব বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রতীক ও রূপক:

পথের প্রান্তে নাটকে প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নাট্যকার সরাসরি রাজনৈতিক বা সামাজিক ভাষ্য প্রদান না করে প্রতীকী নির্মাণের মাধ্যমে গভীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ফলে নাটকটি কেবল কাহিনিনির্ভর নয়; তা ভাবার্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে সমৃদ্ধ।

"পথ" এখানে কেবল কোনো রাস্তা বা ভৌগোলিক সীমানা নয়। এটি ইতিহাসের গতি, সমাজের পরিবর্তন এবং ব্যক্তিগত জীবনের যাত্রাপথের প্রতীক। মানুষের জীবন এক অবিরাম যাত্রা—অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে। নাটকের চরিত্ররা যেন এই পথের যাত্রী, যারা এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই 'পথ' আবার আদর্শের পথও হতে পারে—স্বাধীনতার স্বপ্ন, ন্যায় ও সমতার প্রত্যাশা, কিংবা ব্যক্তিগত সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যখন সেই পথ বাধাগ্রস্ত হয়, তখন মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় সংশয় ও হতাশা। নাটকের চরিত্ররা সেই সংশয়ের প্রতীকী যাত্রী।

"প্রান্ত" শব্দটির মধ্যেও দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে। এটি একদিকে সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়—পুরোনো আদর্শ, বিশ্বাস ও সামাজিক কাঠামোর অবসান। অন্যদিকে এটি নতুন সূচনার সম্ভাবনাও বহন করে। প্রান্ত মানে এমন এক সীমারেখা, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়—সে কি পেছনে ফিরে যাবে, নাকি অজানা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে? নাটকের চরিত্ররা এই প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তাদের জীবনে পুরোনো মূল্যবোধের ভাঙন ঘটেছে, কিন্তু নতুন মূল্যবোধ এখনো সুস্পষ্ট নয়। এই অবস্থাই নাটকের মূল সংকট ও দার্শনিক গভীরতাকে নির্দেশ করে।

নাটকের পরিবেশ নির্মাণও প্রতীকধর্মী। অন্ধকার, আলো-ছায়ার খেলা, সীমিত মঞ্চসজ্জা—সবই সমাজের অনিশ্চয়তা ও মানসিক অস্থিরতার প্রতীক। অন্ধকার যেন হতাশা ও বিভ্রান্তির চিহ্ন, আর আলো আশার ক্ষীণ রেখা।মঞ্চে সীমিত পরিসর ব্যবহার করা হয়েছে, যা চরিত্রদের মানসিক সংকীর্ণতা ও সামাজিক আবদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়। কখনো নীরবতা, কখনো অসমাপ্ত সংলাপ—এসব নাট্যপ্রযুক্তিও প্রতীকী। এগুলি চরিত্রদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমাজের অমীমাংসিত সমস্যাকে দৃশ্যমান করে তোলে।

নাট্যরীতি ও ভাষাশৈলী:

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংলাপনির্ভর ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণভিত্তিক এক স্বাতন্ত্র্যসূচক নাট্যরীতি নির্মাণ করেছেন, যা তাঁর নাট্যসৃষ্টিকে স্বকীয় মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর রচনায় বাস্তবধর্মিতা কেবল বাহ্যিক ঘটনাবিন্যাসে নয়, চরিত্রের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও সামাজিক অবস্থানের মধ্যেও গভীরভাবে প্রতিফলিত। সংযত প্রকাশভঙ্গি তাঁর নাট্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য; আবেগের তীব্রতা থাকলেও তা কখনো অতিনাটকীয় হয়ে ওঠে না। বরং নিয়ন্ত্রিত ভাষা ও পরিস্থিতির সূক্ষ্ম নির্মাণের মাধ্যমে নাট্যকার বাস্তব জীবনের অন্তর্লীন সংকটকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

তাঁর নাটকে সংলাপই প্রধান চালিকাশক্তি। সংলাপগুলো স্বাভাবিক, প্রাঞ্জল এবং দৈনন্দিন জীবনের কথ্যভাষার কাছাকাছি। কৃত্রিমতা বা অলংকারপ্রিয়তার পরিবর্তে তিনি গ্রহণ করেছেন সহজ, জীবন্ত ভাষা। এই সরলতার মধ্যেই নিহিত থাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সামাজিক সমালোচনা। চরিত্রদের কথোপকথনে সূক্ষ্ম কৌতুক, পরিহাস কিংবা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের মাধ্যমে সমাজ ও রাজনীতির অসঙ্গতি উন্মোচিত হয়। ফলে সংলাপ কেবল তথ্যবিনিময়ের মাধ্যম নয়, বরং তা হয়ে ওঠে চিন্তার ক্ষেত্র—দর্শক বা পাঠক সংলাপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে বাধ্য হয়।

ভাষার সরলতা তাঁর নাটকের অন্যতম শক্তি। আড়ম্বরহীন শব্দচয়নেও গভীর ভাবার্থ ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দীর্ঘ বক্তৃতা বা বাগ্মিতার পরিবর্তে তিনি সংক্ষিপ্ত সংলাপ, নীরবতা এবং অর্থবহ বিরতির মাধ্যমে আবেগ ও সংকটকে প্রকাশ করেছেন। এই নীরবতাও এক ধরনের ভাষা—যেখানে অনুক্ত শব্দের মধ্যেই চরিত্রের দ্বিধা, অপরাধবোধ বা হতাশা প্রতিফলিত হয়। ফলে নাটকটি যেমন মঞ্চোপযোগী ও গতিশীল, তেমনি অন্তর্মুখী ও ভাবগম্ভীর।

তাঁর নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো চরিত্রচিত্রণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রাধান্য। চরিত্ররা একমাত্রিক নয়; তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মসমালোচনা, হতাশা ও স্বপ্ন ভাঙার বেদনা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিগত সংকট কখনো বিচ্ছিন্ন থাকে না; তা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই সংযোগ নাটককে বহুমাত্রিক করে তোলে—ব্যক্তিমানস ও সমাজমানস একত্রে ধরা পড়ে। চরিত্রদের মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সময়ের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাট্যগঠন সংযত ও সুসংহত। ঘটনাপ্রবাহে অযথা জটিলতা নেই; বরং ধীরে ধীরে সংকটের আবহ নির্মিত হয়, যা ক্রমে চূড়ান্ত উত্তেজনার দিকে অগ্রসর হয়। তবে নাট্যকার নির্দিষ্ট সমাধান আরোপ করেন না; খোলা সমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে তিনি জীবনের অনিশ্চয়তা ও অমীমাংসিত বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছেন। এই খোলা পরিসর দর্শককে ভাবনার সুযোগ দেয় এবং নাটকের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী করে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সংলাপের প্রাণবন্ততা, ভাষার সংযত সৌন্দর্য, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা এবং গঠনের শৃঙ্খলাবদ্ধতা মিলিয়ে তাঁর নাট্যরীতি এক অনন্য শিল্পমান অর্জন করেছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহই তাঁর নাটককে কেবল সামাজিক দলিল নয়, বরং গভীর মানবিক ও নন্দনচেতনার প্রকাশে পরিণত করেছে।

উপসংহার:

"পথের প্রান্তে" নাটকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজ ও রাজনীতির প্রভাবকে সূক্ষ্ম ও মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, স্বাধীনতা-উত্তর হতাশা, নৈতিক অবক্ষয় এবং পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ—সব মিলিয়ে নাটকটি এক যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিচ্ছবি। এই নাটক আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সমাজ ও রাজনীতি কেবল বহির্জগতের বিষয় নয়; তা মানুষের অন্তর্জীবন, সম্পর্ক এবং স্বপ্নকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সেই অর্থে "পথের প্রান্তে" বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা সমাজ-রাজনীতির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে আজও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। পথের প্রান্তে। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী, বিভিন্ন সংস্করণ।

২. সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।

৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। বাংলা সমালোচনার ইতিহাস। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।

৪. চক্রবর্তী, শিবপ্রসাদ। বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক। আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যচিন্তা। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১২।

৬. ভট্টাচার্য, অমলেন্দু। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্য। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০৪।

৭. চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার। দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১।

৮. মুখার্জী, বিমল। বাংলা মধ্যবিত্ত সমাজ ও সাহিত্যচেতনা। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৭।

৯. ভাদুড়ী, উৎপল। বাংলা নাট্যরীতি ও সমাজবাস্তবতা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫।

১০. রায়, নীরদকুমার। বাংলা সাহিত্যে সমাজ ও রাজনীতি। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৯।

Citation: **Samanta. D.,** (2026) "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "পথের প্রান্তে" নাটকে সমাজ ও রাজনীতির প্রভাব: সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-02, February-2026.